ফকির আলমগীর

স্মৃতিকাব্যে প্রিয়মুখ

স্মৃতিকথা

গেল বছর থেকে এ পর্যন্ত আমরা হারিয়েছি উপমহাদেশের কিছু কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রকার, সাংবাদিক, সুরকার, অভিনেতা, অভিনেত্রীসহ গুণী ব্যক্তিদের। তাদের মধ্যে রয়েছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন, অভিনেত্রী শ্রীদেবী, লোকসঙ্গীত শিল্পী অমর পাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেন, চলচ্চিত্রকার লেখক আমজাদ হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রবীণ রাজনীতিবিদ তরিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আনিসুল হক, চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর, গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব সরকার ফিরোজ, বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহ আলমগীর, আমানউল্লাহ কবির, মানবকণ্ঠের সম্পাদক আবুবকর সিদ্দিক, প্রখ্যাত সাংবাদিক মাহফুজুল্লাহ, জনপ্রিয় সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার, কিংবদন্তি ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চু, সুরকার মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ, সোনালী কাবিনের শক্তিমান কবি আল মাহমুদ, সুরকার জালাল আহমেদ, সুরকার বদরুল আলম বকুল, উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পী সাংবাদিক শফিউল আলম রাজা, ওস্তাদ মতিউল ইসলাম, যন্ত্রশিল্পী খোকন, বাবুল আলী এবং চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা আনিস, টেলিসামাদ ঋষিজ সহঅভিনেত্রী লাইলী হামিদ, পলান সরকার, সুবীর নন্দীসহ অনেক আপনজনকে। কেউ কেউ গেল ঈদে কিংবা ১৪২৫ সনের ১লা বৈশাখে ছিলেন আজ আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। আমি আমার নিবন্ধে কিছু গুণী মানুষের কথা তুলে ধরতে চাই। যারা আছেন আমার হৃদয়পটে। স্মৃতির আয়নায় তাদের প্রিয় মুখগুলো আজ আমাকে ভাবায়, কাঁদায়। তাদের কাউকে কাউকে নিয়েই আমার এ লেখা।

প্রবাদ প্রতিম লোকশিল্পী অমর পাল

আমি আমার নিবন্ধ শুরু করতে চাই সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে যাওয়া ওপার বাংলার প্রখ্যাত লোকশিল্পী অমর পালকে স্মরণ করে। চলে গেলেন দুই বাংলার লোকগানের প্রবাদ প্রতিম শিল্পী অমর পাল। শনিবার ২০ এপ্রিল দুপুরে কলকাতার বাড়িতে তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকে এম হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয় আইসিইউতে। বিকেল ৫টা ৫০ মিনিট নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তার স্ত্রী পুতুল রানী পাল এরই মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ ছেলে রেখে গেছেন। অমর পালের জন্ম ১৯৯২ সালের ১৯ মে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ১০ বছর বয়সে বাবা মহেশ চন্দ্র পলিকে হারান এই শিল্পী। এরপর সংসারের ভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। ছোটবেলা থেকেই অমর পাল ছিলেন গানপাগল। মা দুর্গাসুন্দরী দেবীর কাছে লোকসঙ্গীতে তালিম নেন। পাশাপাশি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন ওস্তাদ আয়াত আলী খানের কাছে। ১৯৪৮ সালে আকাশ বাণীর গীতিকার শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারপর ১৯৫১ সালে তিনি আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে লোকসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করেন। দেবকী বসু, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবিতে গান গেয়েছিলেন তিনি। সঙ্গীত, নাটক, একাডেমিসহ দেশে বিদেশে একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন অমর এই সঙ্গীতশিল্পী।

"হীরক রাজার দেশে" ছবিতে অমর পালের গাওয়া "কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়" গানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া তার প্রভাতী সঙ্গীত, ভাটিয়ালী গানও শ্রোতারা মনে রাখবে বহুকাল। আনন্দবাজার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালেও ছাত্রছাত্রীদের গানের ক্লাস করিয়েছেন অমর পাল। তার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তাঁর প্রয়াণে দুই বাংলায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বাংলার সঙ্গীত জগতে অমর পালের মৃত্যু যেন এক নক্ষত্রের পতন হলো। বাঙালির

লোকসঙ্গীতের পিতাসহ, তিতাসপাড়ের সন্তান আমাদের সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে অবশেষে পরপারে পাড়ি জমালেন। পল্লীগীতি থেকে ভাটিয়ালী, সারি, জারি, বাউল, নজরুল সঙ্গীত, ভক্তিমূলক গানের এক অনন্য শিল্পী অমর পাল। তিনি ছিলেন মাটি মানুষের গায়ক। ত্রিপুরা, শিলচর, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে তিনি সমান জনপ্রিয় ছিলেন।

শাচীন কর্তা গানই কেবল তিনি গাননি তার সান্নিধ্য তাকে করে তুলেছিল উপমহাদেশের জনপ্রিয় গায়কে। আব্বাস উদ্দিনের অনেক গান তিনি গেয়েছেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে লোকবিদ ড. দুলাল চৌধুরীর মাধ্যমে। সেই সুবাদে ড. দুলাল চৌধুরীর গবেষণা ও উপস্থাপনায় কোলকাতার দূরদর্শনে একাধিক অনুষ্ঠান করি আমরা দুই বাংলার দুই লোকশিল্পী। এরপর এপার বাংলায় ঋষিজ আয়োজিত লোকসঙ্গীত উৎসবে ড. দুলাল চৌধুরীর নেতৃত্বে পূর্ণদাস বাউল, অমর পাল, গীতা চৌধুরী, নিরেন্দ্র চৌধুরী, পংকোজ সাহাসহ অনেক বিশিষ্ট শিল্পী অংশগ্রহণ করে। বিশিষ্ট লোকবিদ অধ্যাপক মাহারুল ইসলাম, ড. শাহজালাল, শামসুজ্জামান খানসহ বাংলাদেশের খ্যাতিমান লোকসঙ্গীত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। কিংবদন্তি লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক অধ্যাপক মানসুর উদ্দিন আহমেদ সে উৎসব উদ্বোধন করেন।

এরপরে অমর পাল একাধিকবার তিতাস পাড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর করেন। তার সঙ্গে আমার বেশি দেখা হয় ত্রিপুরায় ড. উত্তম সাহার লোকসঙ্গীত সংস্থার আমন্ত্রণে আমরা দু'জন আগরতলায় সঙ্গীত পরিবেশন করি। বিশেষ করে ১৯৯৮ সালে একটি আয়োজনের কথা আমার মনে আছে। অমর পালের সঙ্গে আমাদের ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর চমৎকার সম্পর্ক ছিল। ১৯৮৭ সালে আমরা যখন ড. দুলাল চৌধুরী, অমর পালদের আমন্ত্রণে সদলবলে কোলকাতা সফরে যাই তখন দূরদর্শন ছাড়াও শ্রীরামপুর, গেলিপার্ক বিবেকানন্দ হলে সঙ্গীত পরিবেশন করি। তারই ধারাবাহিকতায় তারা বাংলার আমন্ত্রণে কিংবা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্মেলনে ২০০৫ ও ২০০৬ এ অমর পালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। লেখক শিল্পী সংঘের অনুষ্ঠানে আমি যখনই সঙ্গীত পরিবেশন করি তখন অমর পাল ছাড়াও সাধনগুপ্ত, রুমাগুহ ঠাকুরদা, শোভাসেন, হাবিব তানভীরসহ বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। অমর পালের সঙ্গে যে স্মৃতি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে তা হচ্ছে "তারা বাংলা" আয়োজিত ইন্দোবাংলা ফোকাস অনুষ্ঠানে আমরা দুজন আমন্ত্রিত ছিলাম। সাবেক রাষ্ট্রদূত দেব মুখার্জির সঞ্চালনায় জয়শ্রী মুখার্জির পরিচালনায় এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ধারণ করা হয়েছিল সুন্দরবনের নদীবক্ষের নয়নাভিরাম প্রাকৃতি পরিবেশে। আমরা দুজন একত্রে এই পরিবহনে নদীর ঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলাম আর সারাদিন নৌযানে গান গল্পে সময় কাটিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে এই আনন্দ ভ্রমণে দেব মুখার্জি, জয়স্ত্রী ছাড়াও তারা বাংলার চেয়ারম্যান রথিকান্ত বসু এবং তার সহকর্মীবৃন্দ ছিলেন। কূটনীতিক, সঞ্চালক, দেব মুখার্জির সঞ্চালনায় আমরা কিছু কথা কিছু গানে একটি অনুষ্ঠান ধারণ করি। এখানেও মনে আছে দেবদা অমর পাল আশার বাণী বাজানোকে বেশ পছন্দ করে, প্রশংসা করে। আজ তার কথা বেশি করে মনে পড়ছে।

কিংবদন্তিতুল্য লোকসঙ্গীত শিল্পী অমর পালের একান্ত সান্নিধ্যে লেখক

দেহ যখন সুরে বিলীন : বারী সিদ্দিকী

গত ২৪ নভেম্বও ২০১৭ বৃহস্পতিবার মাত্র ৬৩ বছরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেশবরেণ্য লোকসঙ্গীত শিল্পী ও প্রখ্যাত বংশীবাদক বারী সিদ্দিকী। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে থেমে গেল মাটির গানের অনন্য এক কণ্ঠস্বর ও বংশীবাদন। রাতের কান্না হয়ে ঝড়ে পড়ল হেমন্তের শিশির, বাউল বাতাস, শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজন, ভক্ত-অনুরাগী যেন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় গুমরে কেঁদে উঠল। যার মৃত্যুতে কেঁদেছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার কূলে কূলে মানুষ, কেঁদেছে সঙ্গীত ভূবনের সতীর্থ শিল্পী, সহকর্মী বন্ধু ও শিষ্যরা। গানের এই শোয়া চান পাখির জন্য কেঁদেছি আমিও। মনে মনে সান্ত্বনা নিলাম এই ভেবে, এমন শিল্পীর মৃত্যু নেই। তিনি চিরকাল আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন তার কালজয়ী গান আর বাঁশির সুরের মূর্ছনায়। যথার্থই বলেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা-অনবদ্য গায়কী দিয়ে বারী সিদ্দিকী প্রমাণ করেছেন, তিনি অনেকের চেয়ে আলাদা। তার ছিল মায়াবী এক দরাজ কণ্ঠ। গান গাওয়ার ভঙ্গিটাও অন্য রকম। তার চলে যাওয়ায় আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির খুব ক্ষতি হলো। তারপরও আমি বিশ্বাস করি, তার গাওয়া গানগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি শ্রোতাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন দীর্ঘকাল।

বারী সিদ্দিকীর মতো শিল্পীর বারবার জন্ম হয় না। সঙ্গীতে তার ধ্যানমগ্ন সাধনা, সহজ-সরল জীবনযাপন, ব্যতিক্রমী গায়কী তাকে অসাধারণ সঙ্গীতব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। একজন ক্লাসিক্যাল মিউজিকে দীক্ষিত শিল্পী হিসেবে তিনি অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রবহমান লোকসঙ্গীতের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। তার কণ্ঠ, সুর, গায়কী বাংলা গানে এক নতুন সংযোজন। সে জন্যই তিনি আপন মহিমায় মহিমান্বিত এবং আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বিভিন্ন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারিত একক পরিবেশনায় তার নিমগ্নতা, অনবদ্য গায়কী, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং সুর ও ছন্দের যে মুন্সিয়ানা আমি লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার বারবার মন হয়েছে, মানুষের বেদনাসিক্ত ভালোবাসা, দুঃখ-কষ্ট, বিরহ-বিচ্ছেদ তিনি যেন ধারণ করে সুর-যমুনায় একাত্ম হয়ে তা পরিবেশন করতেন। তিনি সঙ্গীত পরিবেশনায় এতটাই নিমগ্ন হতেন, কখনও কখনও নিজেই তার গানে বাঁশি বাজাতেন। যন্ত্রানুষঙ্গে যারা থাকতেন তারা উপলব্ধি করতে পারতেন তার সুর-তালের গভীরতা। এ ক্ষেত্রে দেশে খ্যাতিমান বংশীবাদক জালাল তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেছেন, "কারও কাছে সেভাবে বাঁশি শেখার ভাগ্য হয়নি। এক অনুষ্ঠানে রজনী তুই হইস না অবসান গানটি কীভাবে তুলতে হবে, সেটা শিখিয়েছিলেন। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।" এমনি জালাল, নোলক, সোহাগ, পলাশ, পল্লব, আশিকের মতো কত ভক্তকে তিনি কাঁদিয়ে গেছেন, তা লিখে শেষ করা যাবে না। আর তিনি কাঁদিয়ে গেছেন তার আড্ডা আর অবসরের বন্ধু, তার অসংখ্য গানের গীতিকার শহীদুল্লা ফরায়েজির মতো বন্ধুদের। তার অসাধারণ গায়কীর মাধ্যমে প্রাণ পেল, বিশ্বব্যাপী দ্রুত সমাদৃত হলো রশীদ উদ্দিন, উকিল মুন্সী, চান মিয়া প্রমুখের গান। রাধারমণ, শাহ আবদুল করিমের গানের ভাব-রসেও তিনি সিক্ত হয়েছেন। গ্রামীণ লোকসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক ধারায় গান গেয়ে বারী সিদ্দিকী অর্জন করেছেন খ্যাতি।

বারী সিদ্দিকীর গাওয়া 'আমি একটা জিন্দা লাশ কাটিস নারে জংলার বাঁশ'... মরার পরে আর পুড়িস না' গানটি শুনে আমার কেবলই মনে

হয়েছে, তিনি দেহকে সুরের সঙ্গে বিলীন করে অবিনশ্বর আত্মাকে নিয়ে গেছেন ঊর্ধ্ব গগনে। প্রেম-বিচ্ছেদের অনলে তিনি পুড়ে পুড়ে সঙ্গীতের অতল গহীনে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে সঙ্গীত ভুবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা পূরণ হতে বহু সময় লাগবে।

তার মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে, তারপর তার ৩২ বছরের কর্মস্থল বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রাঙ্গণে দু'দফা জানাজায় সরকার, প্রশাসন, সতীর্থ শিল্পীদের অনুপস্থিতি দেখে মর্মাহত হয়েছি। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি চ্যানেল শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাদের আমি সাধুবাদ জানাই। সাধুবাদ জানাই বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়াকে।

পরিশেষে শিল্পীর জীবনকথার প্রতি একটু ফিরে তাকাতে চাই। ১৯৫৪ সালের ১৫ নভেম্বর নেত্রকোনা সদর উপজেলার মৌগাতী ইউনিয়নের ফাইছকা গ্রামে তার জন্ম। পুরো পরিবারই ছিল সঙ্গীত অন্তপ্রাণ। তিনি সঙ্গীত শিখতে শুরু করেন মাত্র ১২ বছরে নেত্রকোনার শিল্পী ওস্তাদ গোপাল দত্তের কাছে। তার পরামর্শে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন তিনি। ওস্তাদ আমিনুর রহমান, দবির খান, পান্নালাল ঘোষসহ অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। একক সময়ে বাঁশির প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বাঁশির ওপর উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে প্রশিক্ষণ নেন। ভারতের পুনে গিয়ে পণ্ডিত ভিজি কার্নাডের কাছেও তালিম নেন। ১৯৯৯ সালে তিনি জেনেভায় বিশ্ব বাঁশি সম্মেলনে যোগ দেন। তা ছাড়া সঙ্গীত পরিচালক ও মুখ্য বাদ্যযন্ত্রী হিসেবে তিনি ৩২ বছর বিটিভিতে কর্মরত ছিলেন। সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ। তবে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরে নব্বইয়ের দশকে শ্রোতাদের নজর কাড়েন বারী সিদ্দিকী। ১৯৯৯ সালে হুমায়ূন আহমেদের রচনা ও পরিচালনায় নির্মিত 'শ্রাবণ মেঘের দিন' চলচ্চিত্রে ৭টি গানে কণ্ঠ দেন তিনি। 'শোয়া চান পাখি', 'আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে', 'নাও বাওয়া মদ্দ লোকের কাম', 'পুবালি বাতাস' ইত্যাদি গান এখনও মানুষের মুখে মুখে। সেই নেত্রকোনার মাটির গায়ক আবার সেই মাটির কাছেই ফিরে গেলেন। চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শেষ ইচ্ছানুযায়ী 'বাউলবাড়ী'তে। গানের শোয়া চান পাখি তার বিরতিহীন যাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। শোয়া চান পাখি আর জাগবে না- শতবার ডাকলেও।

মুক্তিযোদ্ধা সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

চলতি বছর ২২ জানুয়ারি না ফেরার দেশে পাড়ি জমান বাংলা গানের অন্যতম স্রষ্টা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। বলতে গেলে হঠাৎই অকালে সুরের মায়া কাটিয়ে চিরবিদায় নিলেন বরেণ্য সুরকার, গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। এই একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বরেণ্য সুরকারের মৃত্যুর সময় আমি এক সাংস্কৃতিক সফরে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। সতীর্থ শিল্পী ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুলবুলের মৃত্যুর সময় পাশে থাকতে না পারার স্মৃতি আজও আমাকে কাঁদায়। দীর্ঘ চার দশকের ক্যারিয়ারে দুশর বেশি চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করে গেছেন তিনি। 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' 'ও মাঝি নাও ছাইড়া দে, মাঝি পাল উড়াইয়া দে', 'সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবণ্য'র মতো দেশাত্মবোধক গানে তার দেয়া সুর বাংলাদেশের মানুষের বুকে চিরদিন অম্লান থাকবে। তার সুরের মূর্ছনা আপাতত থেমে গেলেও মানুষের হৃদয়ে চিরদিন বাজবে। তার অসাধারণ গানগুলো।

রাজধানীর আফতাবনগরের বাসায় হার্ট অ্যাটাক হলে বুলবুলকে মহাখালীর আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। একুশে পদক পাওয়া এই গানের মানুষটির বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি হৃদযন্ত্রের জটিলতায় ভুগছিলেন। হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় গত বছর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে তার অস্ত্রোপচারও করা হয়েছিল। সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা শেষ কথা জানিয়ে দেয়ার পর পরিবারের সদস্যরা বুলবুলের মরদেহ নিয়ে যান আফতাবনগরের বাসায়। তার মৃত্যু খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে আসে শোকের ছায়া। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এই গীতিকার-সুরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ জানান, বুলবুলের

আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

মরদেহ বারডেমের হিমঘরে রাখা হবে। তার কফিন নিয়ে যাওয়া হবে শহীদ মিনারে। সেখানে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের আগে এই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি জানানো হবে রাষ্ট্রীয় সম্মান। বুলবুলের ছেলে সমীর আহমেদ জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে তার বাবার জানাজা হবে। আসরের পর মিরপুরে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি জন্ম নেয়া আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন মাত্র ১৫ বছর বয়সে। তখন তিনি ঢাকার আজিমপুরের ওয়েস্টটেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল।

২৫ মার্চ রাতের গণহত্যা দেখার পর প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন বুলবুল ও তার কয়েকজন বন্ধু। প্রথমে বিহারিদের বাসা থেকে অস্ত্র ছিনতাই করে ছোট একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেন তারা। পরে জিঞ্জিরায় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি তৈরি করেন। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে ঢাকায় ফিরে আসেন বুলবুল। জানতে পারে বড় ভাই ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ টুটুল মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা দল ক্র্যাক প্লাটুনে যোগ দিয়েছেন। পরে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া গ্রেনেড নিয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে নিউমার্কেটের ১ নম্বর গেটে পাকিস্তানি বাহিনীর লরিতে আক্রমণ করেন বুলবুল ও তার বন্ধু সরোয়ার। আগস্টে ভারতের মেলাঘরে গিয়ে এক দফা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ঢাকার লালবাগ এলাকায় কাজ শুরু করেন বুলবুল ও তার বন্ধু সজীব। তাদের প্লাটুনকে বলা হতো ওয়াই (ইয়াং) প্লাটুন। অক্টোবরে রোজার মাসে আবার ভারতে যাওয়ার সময় কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঝামাঝি তন্তর চোকপোস্টে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে বন্দি হন বুলবুলরা চারজন। নির্মম নির্যাতনের পর তাদের উলঙ্গ অবস্থায় বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারে। সেই জেলখানায় অন্তত ৫৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দি রেখেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। রোজার ঈদের দিন সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশ কর্মকর্তা ছিরু ও তার ছেলেসহ ৩৯ জনকে আলাদা করে জেল থেকে বের করে এনে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা। তাদের মধ্যে একজন প্রাণে বেঁচে যান। দুদিন পর বুলবুলদের চার বন্ধুকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শান্তি কমিটির অফিস দানা মিয়ার বাড়িতে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। সেই রাতেই সেখান থেকে পালিয়ে যান বুলবুলরা। ২০১২ সালের আগস্টে বুলবুল ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেয়ার পরের বছর খুন হন

তার ছোট ভাই আহমেদ মিরাজ। ২০১৩ সালের ৯ মার্চ রাতে কুড়িল ফ্লাইওভারের পাশ থেকে পুলিশ মিরাজের লাশ উদ্ধার করে। সেই ঘটনার বিচার না পাওয়ায় হতাশা ছিল বুলবুলের মনে। ২০১৮ সালের মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি গ্লিটজকে বলেছিলেন সে কথা। গানের ভুবনে চার দশক ১৯৭৮ সালে 'মেঘ বিজলি বাদল' সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন বুলবুল। এরপর আমৃত্যু তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সংগীতের সাধনায়। বেলাল আহমেদের পরিচালনায় ১৯৮৪ সালে নয়নের আলো চলচ্চিত্রের সঙ্গীতায়োজন করেন বুলবুল। ওই সিনেমার জন্য তার লেখা 'আমার সারাদেহ খেয়োগো মাটি', 'আমার বাবার মুখে', 'আমার বুকের মধ্যেখানে', 'আমি তোমার দুটি চোখের দুটি তারা হয়ে' গানগুলো সে সময় তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। এর পরের চল্লিশ বছরে মরণের পরে, আম্মাজান, প্রেমের তাজমহল, অন্ধ প্রেম, রাঙ্গা বউ, প্রাণের চেয়ে প্রিয়, পড়েনা চোখের পলক, তোমাকে চাই, লাভ স্টোরি, ভুলোনা আমায়, আজ গায়ে হলুদ, লাভ ইন থাইল্যান্ড, আন্দোলন, মন মানে না, জীবন ধারা, সাথি তুমি কার, হুলিয়া, অবুঝ দুটি মন, লক্ষ্মীর সংসার, মাতৃভূমি, মাটির ঠিকানাসহ দুই শতাধিক চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেন বুলবুল। প্রেমের তাজমহল সিনেমার জন্য তিনি ২০০১ সালে এবং হাজার বছর ধরে সিনেমার জন্য ২০০৫ সালে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। দেশের সঙ্গীত অঙ্গনে অবদানের জন্য ২০১০ সালে সরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলকে একুশে পদকে ভূষিত করে। চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত আয়োজনের পাশাপাশি দেশের সমকালীন শিল্পীদের নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেছেন বুলবুল। তার কথা আর সুরের গান নিয়ে সাবিন ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, সৈয়দ আবদুল হাদি, এন্ড্রু কিশোর, সামিনা চৌধুরী, খালিদ হাসান মিলু, আগুন, কনক চাঁপাসহ দেশের বহু জনপ্রিয় শিল্পীর অ্যালবাম বের হয়েছে।

ব্যান্ড সঙ্গীতের কিংবদন্তি শিল্পী আইয়ুব বাচ্চু

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সুরের সঙ্গে দেশজ সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আজম খান, আমি, ফেরদৌস ওয়াহিদ, ফিরোজ সাঁই সঙ্গীত ভুবনে একটি নতুন ধারার সূচনা করি। যার নাম পপ সঙ্গীত। সেই পপ সঙ্গীতের ধারাবাহিকতায় আজকের ব্যান্ড সঙ্গীত। নতুন প্রজন্মের কাছে সে সঙ্গীত তুমুলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর ব্যান্ড সঙ্গীতের নায়কেরা হচ্ছেন, আইয়ুব বাচ্চু, জেমস প্রথিমিউস, ওয়ারফেজ, রেনেসাঁসহ অনেক ব্যান্ড দল। এরপর তারা যথাক্রমে ফোয়াদ নাসের বাবু, মাকসুদ, হামিদ, সাফিন মিলে বামবা গঠন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যান্ড সঙ্গীতের জোয়ারে ভেসে যায় তারুণ্য। তারা একেকজন ভক্ত অনুসারীদের কাছে আইকন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আইয়ুব বাচ্চু ও জেমস তাদের পারফরম্যান্স আর গ্ল্যামারে নাম ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিকতায়। রূপালি গিটারের ঝংকারে আর এলআরবির সংঘবদ্ধ উদ্যমতায় আইয়ুব বাচ্চু হয়ে ওঠেন সবার সেরা। দেশপ্রেম আর সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা তাকে সর্বস্তরের শিল্পীদের কাছে প্রিয় করে তোলে। আর তার জনপ্রিয়তা যখন মধ্য গগনে ঠিক তখনই তাকে হারালাম আমরা। ছুটে গেলাম স্কয়ার হাসপাতালে, শ্রদ্ধা জানালাম শহীদ মিনারে, জানাজায় অংশ নিলাম ঈদগাহ ময়দানে। জাতি তার জনপ্রিয়তা টের পেল, ঢাকা, চট্টগ্রামের দুটি জানাজায়। মাকে অনেক ভালোবাসতো আইয়ুব বাচ্চু, সেই মায়ের কবরের পাশেই সে শেষ বিশ্রাম নিলেন। তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যান্ড সঙ্গীতের অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। আজ মনে পড়ছে স্মৃতিকাব্যে অনেক কথা, একত্রে বিদেশ সফরের কথা, মঞ্চে, টেলিভিশনে সঙ্গীত পরিবেশনের কথা। বিশেষ করে চ্যানেল আইতে শুরু করা ব্যান্ড ফেস্টের কথা। সিনিয়র, জুনিয়রদের নিয়ে তার এই উদ্যোগ প্রশংসা পায়।

গত ১৮ অক্টোবর অকস্মাৎ ঝরে পড়েছে আমাদের ব্যান্ড সংগীতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি। প্রায় চার দশক আলো ছড়ানো এই নক্ষত্রের পতনে স্তব্ধ-সংগীতাঙ্গন। কাঁদছে অগণিত ভক্ত-শ্রোতার হৃদয়। কাঁদছে নিঃসঙ্গ রূপালি গিটার। বহু জনপ্রিয় গান আর জাদুকরী গিটারের সুরে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক সোনালি অধ্যায়। গত শতকের আশির দশকের শুরু থেকে নয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের স্বর্ণযুগের অন্যতম স্রষ্টা তিনি। একজন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি যেমন অনবদ্য তেমনি বাংলাদেশের অদ্বিতীয় গিটারিস্ট। তার অকাল মৃত্যু তৈরি করেছে এক অসীম শূন্যতা।

১৯৭৫ সালে চট্টগ্রামের মুসলিম বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় পরীক্ষায় ভালো ফল করায় আইয়ুব বাচ্চুকে তার বাবা একটি গিটার কিনে দেন। বাবার দেওয়া কালো রঙের সেই অ্যাকুস্টিক গিটারেই শুরু তার স্বপ্নযাত্রা। সে সময় বিশ্বের অন্যতম সেরা গিটারবাদক জিমি হেন্ড্রিক্স, জো সাত্রিয়ানি, কার্লোস স্যানটানার পাশাপাশি দেশের পপসম্রাট আজম খানের গিটারবাদক নয়ন মুন্সীর গিটারের পারদর্শিতা আইয়ুব বাচ্চুকে মুগ্ধ করে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন ওদের মতো তাকেও গিটারে পারদর্শী হতে হবে। চট্টগ্রামের রউফ চৌধুরী, বন্ধু নওশাদ ও সাজুর সহায়তায় তিনি গিটার বাজাতে শুরু করেন; দীক্ষ নেন স্পাইডার ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকব ডায়াসের কাছে। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের নিয়ে একটা ব্যান্ডদল গঠন করেন। প্রথমে ব্যান্ডের নাম রাখা হয় 'গোল্ডেন বয়েজ', পরে নাম পাল্টে রাখায় 'আগলি বয়ে'। বিয়েবাড়ি, জন্মদিন আর ছোটখাটো নানা অনুষ্ঠানে এ ব্যান্ডদল নিয়ে গান করতেন বাচ্চু। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা যে যার মতো ছুঠে গেলেও গানের পেছনে লেগে থাকতেন আইয়ুব বাচ্চু। এর মধ্যে ১৯৭৭-৭৮ সালের দিকে 'ফিলিংস' ব্যান্ডের হয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অভিজাত হোটেলে গান গাইতে শুরু করেন তিনি। সেই সময়ের

আইয়ুব বাচ্চুর সাথে লেখক

কথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, 'চট্টগ্রামের অলিগলিতে রাতের পর রাত আমি গিটার হাতে বেরিয়েছি। কাঁধে গিটার নিয়ে বিয়ে বাড়িতে হাজির হয়েছি। গিটার বাজিয়েছি। চট্টগ্রাম আমার নাড়ি পোঁতা শহর। এ শহরে আমার মা ঘুমিয়ে আছে। এ শহরেই আমি আবারও ফিরে আসব।' আইয়ুব বাচ্চু যখন গানের পেছনে ছুটেছেন, ততদিনে মোটামুটি চট্টগ্রাম দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছিল ব্যন্ডদল 'সোলস'। ১৯৭৮ সালের শেষ দিক সেলাসে যোগ দেন বাংলা ব্যান্ডের 'ক্ষ্যাপা' তরুণ হিসেবে পরিচিত পেতে যাওয়া আইয়ুব বাচ্চু। শুরু হলো বাংলার সর্বকালের সেরা একটি ব্যান্ডের যাত্রা। তরুণ তুর্কি আইয়ুব বাচ্চু ছিলেন একাধারে ব্যান্ডের গিটারিস্ট, ভোকাল গীতিকার ও সুরকার।

কতটা গানপাগল মানুষ ছিলেন আইয়ুব বাচ্চু তার প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়, এলআরবি'র ফেসবুক পেজে সেই ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আছে এভাবে— ১৯৯১ সালের এক ফাগুনের দিনে 'সোলস'র গিটারিস্ট সুহাসের চট্টগ্রামের (বর্তমান ফরেস্ট কলোনি) বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সবাই। সঙ্গে ছিলেন গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গি। সেখানে যাওয়ার পর সবাই মিলে আশপাশের পাহাড় অরণ্য ঘুরে বেড়াতে লাগনে সবাই। আইয়ুব বাচ্চু যেখানেই ঘুরে বেড়াতে যেতেন সঙ্গে থাকত গিটার। সবাই যখন

মুগ্ধ প্রকৃতি দেখায় ব্যস্ত তখন আইয়ুব বাচ্চু গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গিকে প্রস্তাব দিলেন 'জঙ্গি ভাই, এমন সুন্দর পরিবেশ গান ছাড়া কি চলে? চলুন আমরা কোনো গান তোলার চেষ্টা করি।' আইয়ুব বাচ্চুর প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গি লেখেন, 'একদিন ঘুম ভাঙা শহরে/মায়াবী সন্ধ্যায় চাঁদজাগা একরাতে/একটি কিশোর ছেলে, একাকী স্বপ্ন দেখে/হাসি আর গানে সুখের ছবি আঁকে।' সেই ঘুমভাঙা শহরে কিশোর ছেলের স্বপ্নের পেছনেই সারাজীবন ছুটে চলেছেন আইয়ুব বাচ্চু। নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করে নিজের ব্যান্ড দল 'ইয়েলো রিভার ব্যান্ড'। কিন্তু বিদেশের এক প্রোগ্রামে গিয়ে দেখেন ভুল করে তার দলের নাম রাখা হয়েছে 'লিটল রিভার ব্যান্ড'। তবে নামটি আইয়ুব বাচ্চুর ভালো লেগে যায়, তাই নিজ দলের নাম রাখেন 'লিটল রিভার ব্যান্ড'। পরে জানা যায়, ওই নামে অস্ট্রেলিয়ায় একটি ব্যান্ড আছে। তাই আবারও নাম পাল্টে রাখা হয় 'লাভ রানস্ ব্লাইন্ড' বা 'এলআরবি'।

'এলআরবি'র প্রথম ব্যান্ড অ্যালবাম 'এলআরবি' প্রকাশ হয় ১৯৯২ সালে। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম দ্বৈত অ্যালবাম। এ অ্যালবামের 'শেষ চিঠি কেমন এমন চিঠি', 'ঘুম ভাঙা শহরে', 'হকার' গানগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯৩ ও '৯৪ সালে তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যান্ড অ্যালবামের 'সুখ' এবং 'তবুও' বের হয়। ১৯৯৫ সালে বের হয় একক অ্যালবাম 'কষ্ট'। এ অ্যালবামের 'কষ্ট কাকে বলে', 'কষ্ট পেতে ভালোবাসি', 'অবাক হৃদয়' ও 'আমিও মানুষ' গানগুলো তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। ২০০৮ সালে বের হয়েছিল সর্বশেষ অ্যালবাম 'স্পর্শ'।

এ ছাড়া আইয়ুব বাচ্চু গান করেছেন বেশকিছু মিশ্র অ্যালবামে। যার মধ্যে প্রিন্স মাহমুদের সুরে 'এখনো দু'চোখে বন্যা', 'শেষ দেখা', 'দাগ থেকে যায়', 'দেয়াল', 'পিয়ানো' অ্যালবামগুলোতে তার গাওয়া গানগুলো দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। কয়েকটি চলচ্চিত্রেও গান করেছেন আইয়ুব বাচ্চু। 'ব্যাচেলর' ছবিতে 'আমি তো প্রেমে পড়িনি', 'অনন্ত প্রেম' ছবিতে 'অনন্ত প্রেম তুমি দাও আমাকে', 'সাগরিকা' ছবিতে 'সাগরিকা বেঁচে আছি', 'আম্মাজান' ছবিতে 'আম্মাজান' গানগুলো বাংলার জনসাধারণের মন জয় করে।

জনপ্রিয় গান

সেই তুমি, কষ্ট পেতে ভালোবাসি, এখন অনেক রাত, কেউ সুখী নয়, হাসতে দেখ গাইতে দেখ, এই রূপালি গিটার ছেড়ে, ফেরারি এ মনটা আমার, সে তারা ভরা রাতে, ঘুমন্ত শহরে, মাধবী, গতকাল রাতে, রাতের তারার মতো, হকার, তোমাকে ভালোবাসি না, একদিন ঘুম ভাঙা শহরে, একটা চাকরি হবে, কোনো অভিযোগ নেই, ওই রাত ঘুমালো, রাজকুমারী, এই শহর এখন ঘুমিয়ে গেছে, যদি তুমি ভালোবাস আমায়, বাংলাদেশ, ওড়াল দেব আকাশে, একচালা টিনের ঘর ও দুনিয়ার মানুষও ভাই, তাজমহল, মেয়ে, মন চাইলে মন পাবে, বেলা শেষে ফিরে এসে, এই কোলাহল, যে তুমি কথা রাখনি, সাড়ে তিন হাত মাটি, ১২ মাস, বনলতা সেন, একটাই মন যখন তখন, বড় বাবু মাস্টার, ওই দূর আকাশের তারারে, লোকজন কমে গেছে, কতদিন দেখেনি দু'চোখ, তিন পুরুষ, আজ থেকে আর কখনো, বাবা, এক আকাশ তারা, নদীর বুকে চাঁদ পড়েছে, আমি তো প্রেমে পড়িনি, এই জগৎ সংসারে, সাগরিকা অনন্ত প্রেম, আম্মাজান।

দেশবরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ

২৩ মার্চ ২০১৯ শনিবার মধ্যরাতে এই কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তার গান কয়েক প্রজন্মের বেড়ে ওঠার সঙ্গী। আপন সৃষ্টিকর্ম তাকে অমর স্মরণীয় করে রাখবে। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানের অমর সুরকার আনোয়ার পারভেজ ও 'বাংলা চলচ্চিত্রের চিরসবুজ নায়ক, গায়ক জাফর ইকবাল ছিলেন তার ভাই। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই সঙ্গীত পরিবারের শেষ বাতিটি নিভে গেল। সঙ্গীত অঙ্গনে তাদের অভাব সহজে পূরণ হবার নয়। এই সঙ্গীত পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অনেক গভীরে। নায়ক, গায়ক জাফর ইকবাল ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঢাকার পল্টন এলাকার বাসিন্দা ছিল এই পরিবার। পল্টন '৬৯' এর সদস্য হিসেবে এই এলাকায় জাফর ইকবাল, মানিক, মুক্তা, মাহবুব, ওমর, কেনেডী, জামি, মনি, আলী আশরাফ, চুনী, টুলি খলিল, দুলাল, খসরু, নসরুসহ অনেকের সঙ্গে সেই ষাট দশক থেকে আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছি।

বিভিন্ন আড্ডা, গল্প গানে আমরা একত্রে বেড়ে উঠেছি। আমরা ডাকতাম তাকে শাহীন বলে। একত্রে কত দেশে সাংস্কৃতিক সফরে গিয়েছি। রেডিও, টেলিভিশন, মঞ্চে গান করেছি। কখনও কখনও বাসায়ও গিয়েছি গান তোলার জন্য। শাহীনের স্বামী আবুল বাসার রহমতুল্লাহ ভাই আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আজ তার কথা লিখতে গিয়ে স্মৃতিকাব্যে অনেক কথাই ভেসে বেড়াচ্ছে, যা লিখলে কেবল নিবন্ধটি দীর্ঘ হবে। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ অনেক বড় মাপের কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। সবধরনের গানেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। কি অপূর্ব কণ্ঠ ছিল তার। দেশের গান, আধুনিক গান, গজলে তার অসাধারণ গায়কিতে মুগ্ধ হয়েছেন এ দেশের সঙ্গীতপ্রেমীরা।

একজন সত্যিকারের সঙ্গীত শিল্পীর যেমন ভদ্র হওয়া উচিত শাহনাজ রহমতুল্লাহ ঠিক তেমনি ছিলেন। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে যেমন তিনি শতভাগ সফল ঠিক তেমনি মানুষ হিসেবেও নিরহংকার প্রচার বিমুখ এই কণ্ঠশিল্পী জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল সঙ্গীতকেই নিবেদিত ছিলেন।

তার গাওয়া কালজয়ী গানগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। তিনি কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন।

১। এক নদী রক্ত পেরিয়ে
২। জয় বাংলা বাংলার জয়
৩। একবার যেতে দেনা আমার
৪। একতারা তুই দেশের কথা
৫। প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ।
৬। আমার দেশের মাটির গন্ধে
৭। আমায় যদি প্রশ্ন করো
৮। সে ছিল দৃষ্টির সীমানায়
৯। ফুলের কাছে ভ্রমর এলে
১০। পারি না ভুলে যেতে
১১। সাগরের সৈকতে যে কেন ডাকে আয়।
১২। কে সেই সোনার কাঠি ছোঁয়ায় প্রাণে।
১৩। শুনেন শুনেন জাহাপনা
১৪। সাগরের তীর থেকে
১৫। সেভাবে বাঁচি বেঁচে তো আছি
১৬। আমি সে কেবল বলে তুমি
১৭। একটু সময় দিলে না হয়
১৮। স্বপ্নের চেয়ে সুন্দর কিছু নাই
১৯। তুমি কি সেই তুমি
২০। ঘুম ঘুম ঘুম চোখে
২১। ও যার চোখ নাই
২২। তোমারে আগুনে পোড়ানো এই দুটি চোখ
২৩। যদি চোখের দৃষ্টি দিয়ে
২৪। আমি সাত সাগরের ওপার হতে।
২৫। বন্ধুরে তোর মন পাইলাম না।
২৬। আমি তো আমার গল্প বলেছি।
২৭। আবার কখন কবে দেখা হবে।
২৮। খোলা জানালায় চেয়ে দেখি।
২৯। একটি কুসুম তুলে দিয়েছি।
৩০। ক্ষণিকের ভালো লাগা।

বলাইবাহুল্য বিবিধ জরিপে এই কালজয়ী কণ্ঠশিল্পীর অনেকগুলো গান স্থান পেয়েছিল। তবে জীবনের শেষের দিকে তিনি অভিমান বুকে নিয়ে চলে গেলেন। শাহনাজ রহমতুল্লাহ একাধিক ভাষায় গান করতে পারতেন। তাইতো তিনি রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিনের মতো বিশ্বের প্রতিটি দেশে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। যিনি গেয়েছিলেন "সে ছিল দৃষ্টির সীমানায়/
সে হারালো কোথায় আজ দূর অজানায়" সেই গানই তার জীবনে সত্য

২০০৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে এক অনুষ্ঠানে সাদি মোহাম্মদ, শাহনাজ রহমতুল্লাহ ও তপন চৌধুরীর সঙ্গে লেখক

হলো। নিজের গাওয়া গানের কথার মতোই মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। দেশাত্মবোধক গানে এদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক কণ্ঠস্বর শাহনাজ রহমতুল্লাহ। তার গাওয়া 'এক নদী রক্ত পেরিয়ে', 'একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়', 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল'। বিবিসি জরিপে সর্বকালের সেরা কুড়িটি বাংলা গানের তালিকায় স্থান অর্জন করে। যে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া তার গাওয়া গানের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারি শাহনাজ রহমতুল্লাহ কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সারাদেশে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। আনোয়ার পারভেজ ছাড়াও আলাউদ্দিন আলী, খান আতাসহ দেশের প্রথিতযশা সুরকার গীতিকারদের সাথে কণ্ঠ দেন। তিনি ষাট দশকে পশ্চিম পাকিস্তানে গজল সম্রাট মেহেদী হাসানের কাছে সরাসরি গান শেখেন। পরিশীলিত ও উদাত্ত কণ্ঠস্বর বাংলাভাষার শিল্পীদের মধ্যে শাহনাজ রহমতুল্লাকে স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত করে তোলে। তিনি স্বামী, এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। শাহনাজ রহমতুল্লাহ একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অনেক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

বরেণ্য কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দী

অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন কিংবাদন্তি কণ্ঠশিল্পী। হাজার প্রাণের আকুতি, ভক্ত অনুরাগীদের প্রার্থনার সাথে সঙ্গীতাঙ্গনের সকলের প্রার্থনা ছিল ফিরে আসুক দেশবরেণ্য কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দী। কিন্তু ভাগ্যের বিধান মানতে হয়, সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে ৭ মে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৪টায় না ফেরার দেশে চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত, চারবার চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী সুবীর নন্দী। গত ১২ এপ্রিল মৌলভীবাজারে আত্মীয়ের বাড়িতে পরিবারের সবাই মিলে সেখানে বাসন্ত পূজার অনুষ্ঠানে। তার দুদিন পর ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ ঢাকায় ফেরার পথে ট্রেনেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাত ১১টার দিকে তাকে সিএমএইচ এ নিয়ে এসে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। প্রায় ১৮ দিন তিনি সিএমএইচে অচেতন ও নির্বাক ছিলেন। এরপর শিল্পীবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য ৩০ এপ্রিল সিএমএইচ থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শিল্পী কখনো সচেতন আবার কখনো কখনো অচেতন আবার কখনো নির্বাক। প্রতিক্ষিত দেশবাসী, সতীর্থ শিল্পী, ভক্ত অনুরাগী, আত্মীয়স্বজনরা ছিল উদবেগ, উৎকণ্ঠায় একটি সুস্থ জীবনের প্রত্যাশায়।

অচেতনে নির্বাক ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দী। শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। সিঙ্গাপুর নেয়ার পর তার তিনবার হার্ট অ্যাটাক জীবনকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। হার্টে চারটি স্টেন্ট পরানো হয়েছিল। স্মৃতির প্রহর ছেয়ে জীবন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার দেহখানি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। সিএমএইচে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তার জন্য দেশবাসীর দোয়া ও চিকিৎসা সবই যেন স্রষ্টার কৃপার কাছে মাথানত করে হেরে গেল। সিঙ্গাপুরে বাবার এই নিষ্ঠুর সময়গুলোর সাক্ষী হয়ে রইলেন সুবীর নন্দীর অনেক আদরের কন্যা ফাল্গুনী নন্দী, তার পাশাপাশি উদবেগ আর উৎকণ্ঠার প্রহরগুলো অতিবাহিত করছিল জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির জাতীয় সমন্বয়ক সামন্তলাল সেন, জামাতা রাজেশ শিদকার, পরিবারের স্বজনসহ হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগী আর শিষ্যরা। পাশাপাশি আমার পরিবারও এই গুণী শিল্পীর ফিরে আসার প্রতি গভীর আগ্রহে ছিল। কারণ সুবীর নন্দী হবিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করলেও তার এবং আমার শ্বশুরবাড়ি মৌলভীবাজারে, আমার স্ত্রী ও বৌদি একই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। সতীর্থ শিল্পী ছাড়া আমার সঙ্গে তার ৪৫ বছরের বন্ধুত্ব। পারিবারিকভাবে সে ছিল আমাদের অনেক ঘনিষ্ঠ। আমাদের সকল পারিবারিক, সামাজিক অনুষ্ঠানে তার সরব উপস্থিতির অনেক স্মৃতি আজ কেবল কাঁদায়। স্মৃতিকাব্যে ভেসে ওঠে অনেক কথা, এই তো সেদিন আমেরিকা থেকে একসাথে ফিরেছি। প্রবাসীরা তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। তারপরই সরকার তাকে একুশে পদকে ভূষিত করেছে। ২০১৭, ১৮, ২০১৯ আমেরিকায় তার সাথে দেখা হয়েছে, একত্রে অনুষ্ঠান করেছি। তখনই ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছি তার শারীরিক অসুস্থতার কথা। তার আপন ভাই সেখানে থাকেন, সেখানে উন্নত চিকিৎসা নিতে পারতেন, তারপরও তিনি দেশে ফিরেছেন। আমাকে সে জামাই বলে সম্বোধন করতেন, তাকে নিয়েই ৩৬ বছর আগে ঋষিজ শিশু পার্কের সামনে নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম। তাকে ভূষিত করা হয়েছিল ঋষিজ পদকে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী সুবীর নন্দীকে ফুলেল শুভেচ্ছা

এক অনুষ্ঠানে সুবীর নন্দীর সঙ্গে লেখক ও অন্যরা

ও অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় শেষ শ্রদ্ধা জানালো জাতি। বেলা ১১টায় সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেয়া হয় সুবীর নন্দীর মরদেহ। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ, গণপূর্তমন্ত্রী রেজাউল করিম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুসহ অনেক রাজনীতিবিদ।

এছাড়া সুবীর নন্দীকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে আসেন সতীর্ত শিল্পী ও বিনোদন জগতের অনেকে। এর মধ্যে ছিলেন গাজী মজহারুল আনোয়ার, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, রামেন্দু মজুমদার, নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, গোলাম কুদ্দুস, হাসান আরিফ, রথীন্দ্রনাথ রায়, খুরশীদ আলম, ফকির আলমগীর, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, খায়রুল আলম শাকিল, রফিকুল আলম, তিমির নন্দী, শহীদুল্লাহ ফরায়েজী, এন্ড্রু কিশোর, কুমার বিশ্বজিৎ, শুভ্রদেব, রবি চৌধুরী, তপন চৌধুরী, এসডি রুবেল, ফুয়াদ নাসের বাবু, ফরিদ আহমেদ, অরুপরতন চৌধুরী, নতুন, মনিরুজ্জামান, মানস আহমেদ, সুমনা হক, নকীব খান, বাদশা বুলবুল, সাব্বির, রাশেদ, তপন মাহমুদ, কিশোর, নিশিতা বড়ুয়া, মাহমুদ সেলিম, ফকির সিরাজ, সসর বড়ুয়া, মাহজার চৌধুরী সুইট, বিশ্বজিৎ রায়, কবির বকুলসহ অনেকে। তারপর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সুবীর নন্দীর মরদেহ নেয়া হয় বিএফডিসিতে। ছায়াছবিতে অনেক গান গেয়েছেন বলেই তাকে বিএফডিসিতে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নায়ক আলমগীর, ওমর সানি, মুশফিকুর রহমান গুলজার, বদিউল আলম খোকন, সোহানুর রহমান সোহান, ড্যানি সিডাক, অরুণা বিশ্বাস, জায়েদ খানসহ অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী, নির্মাতা তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর ১টা ৩০ মিনিটে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় চ্যানেল আইতে। তবে রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্রে তাকে নেয়া হয়নি। সেখানে তাকে নেয়া উচিত ছিল। যা হোক চ্যানেল আই থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রামকৃষ্ণ মিশনে। এরপর বিকাল ৫টায় সবুজবাগে বরদেশ্বরী কালিমন্দির ও শ্মশানে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

তবে শিল্পীর মৃত্যু নেই। তিনি ছিলেন শিল্পীদের প্রিয় শিল্পী। সারাজীবন সাধনা করে তিনি সাধক হয়েছিলেন। গানের বাইরে তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ। প্রচারবিমুখ, নম্র, ভদ্র, ধ্যানমগ্ন একজন শিল্পী। আধুনিক বাংলা গান ছাড়াও তিনি নজরুল সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন, লোকসঙ্গীতসহ অনেক সঙ্গীতে পারদর্শী একজন পরিপূর্ণ শিল্পী। তাই তো চেলে গেল দেহ, রয়ে গেল কণ্ঠ। তার গাওয়া জনপ্রিয় কিছু গানের প্রতি লক্ষ্য করলেও বোঝা যাবে তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন। তার অভাব কখনই পূরণ হওয়ার নয়। তবে এ গানগুলো বহুদিন ধরে শ্রোতাদের মনে আলোড়িত হবে।

তার গাওয়া জনপ্রিয় গান

১। পাখিরে তুই
২। বন্ধু তোর বরাত নিয়া
৩। পাহাড়ের কান্না
৪। সেই দুটি চোখে
৫। আমি কি দোষ করেছি
৬। আমি পথে পথে ঘুরি
৭। কেন ভালোবাসা হারিয়ে যায়
৮। নেশার লাটিম ঝিম
৯। আমার এ দুটি চোখ পাথর তো নয়
১০। বন্ধু হতে চেয়ে তোমার শত্রু বলে
১১। বৃষ্টির কাছ থেকে কাঁদতে শিখেছি
১২। চাঁদে কলঙ্ক আছে
১৩। দিন যায় কথা থাকে
১৪। একটা ছিল সোনার কন্যা
১৫। ও আমার উড়াল পঙ্খীরে
১৬। হাবলঙ্গের বাজারে
১৭। কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো